অন্ধ যখন দেখে

দিলরুবা শাহানা

খুব প্রত্যয় নিয়ে ইরাম 'ঊষার রশ্মি' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদককে নিজের লেখা প্রথম গল্পটি দিল। সম্পাদক বললেন 'আপনিই পড়ে শুনান, পছন্দ হলে এখনই জানিয়ে দেব।'
সামান্য ইতস্তত করে ইরাম বললো 'কাহিনী গুলো বাস্তব থেকে নেওয়া'
'পড়ুন দেখি আগে'
ইরাম উৎসাহ পেয়ে পড়তে শুরু করলো।
সাহিত্য সম্পাদক ও পাশে বসা তার দুই আঁতেল বন্ধু গল্প শুনতে মন দিলেন।

""ওরা গল্প করছিল। তিন জন মেয়ে বা তিন জন নারী। তিনজন ঠিক সমবয়সী না হলেও সমমনা। দু'জন চাকরী করে। আরেক জন সদ্য চাকরী পেয়েছে তবে যোগ দেয় নি এখনও। কর্মরতা দু'জন লাঞ্চের পরেই নানা উছিলা বা ছুতা দেখিয়ে আধ বেলা ছুটি নিয়েছে। উদ্দেশ্য নতুন কর্মপ্রাপ্তাকে শলা-পরামর্শ দেওয়া আর গল্প করা। পার্কের সবুজ ঘাসে নয়, ক্যাফেতে নয়। ছয়তলার ব্যালকনীতে পরামর্শ সভা ও আড্ডা। নানা বিষয়ে আলাপ জমে উঠেছিল। রান্না-বান্না, ফ্যাশন, ঘর সাজানো বা কেতা মাফিক বলা যায় গৃহ শৈলীও ছিল আলোচনার বিষয়।

ওদের গল্প ও হাসির টুক্রো-টাক্রা শাশুড়ির ঘরেও ছিটকে এসে পড়ছিল। মনে হল ওদের গলা হঠাৎ যেন খাদে নেমে গেছে। শাশুড়ি ভাবলেন কি এমন কথা ওরা বলছে যা তাকে ওরা শুনতে দিতে চায়না। উনি কান পাতলেন। তিনজনের একজন তার নিজের মেয়ে। সুতরাং তার কোন খুঁত নিয়ে যে হাসাহাসি হচ্ছে না সে ব্যাপারে উনি নিশ্চিত।

খুঁত, হ্যাঁ খুঁত নিয়ে হাসাহাসি করাকে উনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না, সত্যিকার অর্থে হাসাহাসি করাকে ভয় পান। জগতে কোন মানুষই নিখুঁত হয়না। যে অন্যের খুঁত নিয়ে হাসে তার ভাগ্যে খুঁত-ওয়ালা জিনিসই জোটে। তার ছোটবেলায় একটি মেয়ে অন্য একটি চশমা পরা মেয়েকে চারচোখা বলে খেঁপাতো। আশ্চর্য কাণ্ড পরে ওর নিজের বাচ্চার তিন বছর বয়স থেকে চশমা লেগেছে। আর ওর বাচ্চাকেও অন্য বাচ্চারা চশমা-চোখা বলে ক্ষেপায়। নিজের বাচ্চার চোখে চশমা দেওয়ার পর সে অনুশোচনা করে বলেছিল একদিন না বুঝে ওই ছোট্ট মেয়েকে চশমা চোখে দেওয়ার কারণে টিটকারি মেরে কষ্ট দিয়েছিল বলেই হয়তো আজ তার শিশু পুত্রের চোখেও চশমা। যে কষ্ট সে অন্যকে দিয়েছিল সেই কষ্ট এখন তার বুকে শত গুণে বিঁধছে।

শাশুড়ি বিছানা ঘেঁষা জানলার কাছে সরে এসে কান পাতলেন। তার মেয়ে ছোটভাইয়ের বউয়ের বড় চাকরী হওয়াতে দশজনের কাছে বড় মুখে বলছে। নানা বুদ্ধিও দিচ্ছে সে।

ওরা বলছে ঘরের বাইরে মেয়েদের কি কি সমস্যার মুখে পড়তে হয় ও সে সব সমস্যা কিভাবে মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়। নিজেদের অভিজ্ঞতা, এছাড়াও অন্যদের কাছে শোনে শেখা নানা ঘটনা কি সুন্দর ভাবেই বর্ণনা করছে, শিখছে, শেখাচ্ছে। এই যে অভিজ্ঞতার ভাগাভাগি এতে ওরা যে কতটা ঋদ্ধ হচ্ছে তা ভেবে শাশুড়ি চমৎকৃত হলেন। এক বস বা পদস্থ উপরওয়ালার হ্যাংলামি বন্ধের জন্য তার বউকে স্টাফ ফ্যামেলী ক্লাবের কনভেনর বানানোর বুদ্ধিও বের করেছিল সংস্থার কর্মীরা। কারা যেন কোথায় কার্টুন তৈরি করে গোপন হেনস্তাকারীকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। ইত্যাদি অনেক ঘটনাই বলে চলছিল বাইরে-ঘরে দুই জগতেই ব্যস্ত মেয়ে দু'টি। এর কোনটা হাস্যকর, কোনটা অপ্রীতিকর। এইসব গল্প ওরা সবাইকে বলবেনা, বলবে একান্তে নিজেদের মাঝে।। মেয়ে বলে বাইরের জগতে একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয় বলেই ওরা বলছে। সমস্যার মাঝেও নিজেদের নিরাপত্তার বেষ্টনী তৈরির কৌশল গুলো ওরা একে অন্যকে শুনাচ্ছে। শাশুড়ি স্বস্তি পেলেন, প্রীত হলেন। ভাবলেন অফিস-আদালত বা রাস্তা-ঘাটে শুধুমাত্র মেয়ে বলেই অপদস্থ হলে মেয়েরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে। অথচ ঘরের ভেতরে যখন নিকট আত্মীয়ের অশালীন আচরণ মেয়েদের ভীত ও বিপর্যস্ত করে তখনতো তারা সংসারের শান্তি ও সম্মানের কথা ভেবে চুপ থাকে। নীরব থেকে কৌশলে নিজেকে অবমাননা থেকে রক্ষাই করে চলে শুধু।

একজন বললো
-অফিস সময়ের পর যদি জরুরী কাজ সারার তাগিদে কখনো অফিসে থাকতে হয় কলিগ বান্ধবীর মাঝে কাউকে অনুরোধ করবে একটু অপেক্ষা করতে আর...
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অন্যজন বলে উঠলো
-কার এমন দায় পড়েছে ছুটির পরও কলিগের স্বার্থে বসে থাকবে?
-নিজেদের মাঝে এমন বোঝাপড়া থাকবে যে কলিগ বান্ধবীর প্রয়োজনে তোমাকেও ঐ ত্যাগটুকু স্বীকার করতে হবে
-আমি কি করি জান?
বাকী দু'জন একসাথে প্রশ্ন করলো
-কি কর বলতো?
-আমার অধীনস্থ মেয়েদের কেউ একজনকে মামুলী কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখি পরে ঐ কাজের জন্য ওকে ওভারটাইম বিল দিয়ে দেই। তবে তোমার বুদ্ধিও চমৎকার। এরকম সামাজিক সম্পর্ক-জাল তৈরি করেও নিরাপদ থাকা যায়।
-আচ্ছা মেয়েদের কেন বাইরে কাজ করতে গিয়ে এতো কিছু ভেবেচিন্তে এগুতে হয় বলতো?
-একটা ছেলে যদি অফিস ছুটির পরও ফাইলে মুখ গুজে বসে থাকে তখন বলা হবে সাংঘাতিক কাজ পাগল লোক আর মেয়ের ক্ষেত্রে বলা হবে প্রমোশনের আশায় জান দিয়ে খাটছে।
অন্য মেয়েটি বললো

-একলা বসে অফিস আওয়ারের পর কাজ করতে হলে প্রমোশনের লোভে বললেতো শোভন শুনায় তখন বলা হবে কার মন ভুলানোর জন্য যেন মেয়েটি কাজ করার ভান করে যাচ্ছে।
-বাইরের চেয়ে ঘরটাই মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয় কি?
কথাটা শুনেই শাশুড়ি চমকালেন। ভাবলেন এখানে তার কিছু বলার আছে। বলতেই হবে তাকে। গড়াতে গড়াতে বিছানার কিনারে এসে ঝটিতে উঠে বসলেন। পা টেনে টেনে আলমারির কাছে গেলেন। কষ্টে আলমারির দরজা খুলে কাপড়ের ভাজ থেকে মলিন খাতাটা হাতে নিলেন। এমন সুযোগে মেয়েদের কিছু বলা যায়। যে কথা দু'জন ছাড়া কাউকে কোনদিন বলেন নি। তার নিজের শাশুড়ি অবশ্য যখন ঘটনা ঘটেছিল তখনই ব্যাপারটা আন্দাজ করে পরিশীলিত আভিজাত্য ভুলে চাপা রাগে হিসহিসিয়ে উঠে বলেছিলেন 'বেজন্মামার স্বভাব ভাল না আমি টের পেয়েছি আগেই; রাগী কাজের মেয়ে যখন অশোভন ভাবে গায়ে হাত দিয়ে ঠাট্টার প্রতিবাদে চিল-চিৎকার দিল ওকে অনেক তোষামোদ আর ব্যাগলতা করে চুপ করিয়েছি। আমার মেয়ে জানার আগেই অনেক বখশিশ দিয়ে ওকে কাজ থেকে বিদায় করেছি। বৌমা আমার ছেলেকেও তুমি কিছুই বলো না কেমন। এই দয়াটা কর মা!'

স্বামীকেও ঐ কুৎসিত অভিজ্ঞতার কথা কোনদিন বলেন নি। শাশুড়ির অনুরোধ কান্নার মত তার কানে বাজতো। ঘরের অনেক বিশ্রী অভিজ্ঞতা মেয়েরা ভয়ে ও লজ্জায় কাউকে বলে না। উনি তখন নতুন বউ। বলার মতো জায়গা কোনটা জানতেন না। তবে শাশুড়ি তাকে আগলে আগলে রাখতেন নিজ আত্মীয়ের কদর্য ব্যবহার থেকে।
বহু বছর পর এক বান্ধবী তাকে বলে আরও অদ্ভুত এক ঘটনা। ঘটনাটা এমন আশ্চর্য যাকে এক অলৌকিক উদ্ধার মনে হয়েছিল। বান্ধবীর তখন কিশোরী কাল। কাজের বুয়া আর সে বাসায়। এক বয়সী জ্ঞাতি ভাই এসেছেন। বিবাহিত দুই বাচ্চার বাবা সে। এসেই হাঁক ডাক
- খালা কই, খালা কই?
- নীচ তলার বাচ্চাটার অসুখ মা দেখতে গেছেন।

বলেই বারান্দার নকশাদার গ্রিলে থুতনি রেখে নীচে মাকে ডাকবে কিনা ভাবলো। আচমকা পিছন থেকে তাকে ঝাপটে ধরলো কেউ। মা বলে চিৎকার করেছে মাত্র। তখনই বারান্দার বইয়ের আলমারির উপর থেকে পাশের বাড়ীর বিড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়লো বান্ধবীর কাঁধে। বাঁধন খুলে গেল। মুক্তি পেল সে। বেঁচে গেল সে।
মাকে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। মাকে সাথে নিয়ে ফিরে এসে দেখে ভাই হাওয়া। পরে কথাটা মাকে বলাতে তাকে উল্টো বকা ঝকা করা হয়েছিল। বয়সে বড় গুরুজন বা মুরব্বীর নামে এমন কথা বলতে নাই বলে উপদেশও দিয়েছিল মা। ঐ দিন বিড়ালটাই ছিল ওর জন্য বাঁচোয়া।
বান্ধবীর কথা শুনে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হয়েছিল। হৃদয়বতী শাশুড়ি অন্ততঃ বুঝেছিলেন ওর হেনস্থা হওয়ার কথা।

স্বামীর বড়বোনের জামাই মানে ননাশের জামাই মেহমান। নতুন বউ চা নিয়ে গিয়েছিল। কাপটা টেবিলে রেখেছে মাত্র। হাতটা খামচে ধরলো নেকড়ে। টেবিলে বসা বাড়ীর পোষা বিড়াল হাতের উপর মারলো ঝাপ কাপ গেল উল্টে । গরম চা ছলকে সবটুকু পড়লো মেহমানের কোলে। পুড়েছিল শরীর। পুড়েছিল কি চরিত্রের কদর্যতা। সংসারের শান্তি বাঁচাতে বউটি আজীবন রইলো নিশ্চুপ।

অলৌকিক বিড়াল নামে ঘটনা দু'টো তার খাতাতে লিখিত আছে। খাতাটা হাতে নিয়ে উনি(যিনি ব্যালকনীতে বসা মেয়েদের একজনের মা এবং একজন মেয়ের শাশুড়িও) দেয়াল ধরে পা হেচরাতে হেচরাতে এগুচ্ছেন। উনি নিরাপদ পরিধির বিড়ম্বনার খবর বাইরের মেয়েদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। বড় কষ্টের এই যাত্রা! কতদূর? আর কতদূর যেতে হবে ভাঙ্গা পা ও ভীরু মন নিয়ে তাকে?""

সম্পাদকের চেহারায় ইস্পাত-কাঠিন্য নেমে আসলো। এক বন্ধু বলে উঠলেন ‘বাহ্ এই গল্প নারীবাদী তাত্ত্বিকদের কাজে লাগবে!’

সম্পাদক বিরক্তি নিয়ে বললেন ‘শুনুন আমি গল্পের কারবারি, গল্প বলুন, গল্প লিখুন সত্যি ঘটনা কতই তো জানি, ফালতু সত্যি জানার দরকার কি?’
অন্য বন্ধুটি বললো ‘সম্পাদক-বাবু সত্যি সবসময় ফালতু হয়না, নোবেল পুরষ্কার পাওয়া এক বইয়ের মূল চরিত্র সান্টিয়াগো বাস্তবে এমন একজন সত্যিই ছিল জান তো?’

‘কোন বই, লেখকের কি নাম?’ আরেক বন্ধু জানতে চাইলো।
‘সম্পাদক-সাহেব বলুক, সে জ্ঞানী মানুষ তার জানা আছে নিশ্চয়’
বন্ধুদের কথা এড়িয়ে গিয়ে সম্পাদক ইরামকে বললো ‘আপনি যান এখন, পারলে নতুন গল্প, হ্যাঁ গল্পই লিখে আনবেন, সত্য নয়’
কষ্ট চেপে ইরাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াতে দাড়াতে প্রশ্নকারীকে বললো ‘বইটা হচ্ছে The Old Man and the See আর লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে’
‘বাহ্ বাহ্!’ বলে ইরামকে বাহবা দিল দু'জনই। সম্পাদকের কঠিন চোখ আরও কঠিন হল।""

বাসায় ফিরে ইরাম চুপচাপ শুয়ে রইলো। বিকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে গল্প লেখা কাগজ ক'টি জ্যাকেটের পকেটে পুরে বাসা থেকে বের হল। দুপুরেও খায়নি বিকালেও চা না খেয়ে বের হচ্ছে বলে মা পিছন পিছন এসে অনুযোগ করলেন, গাড়ী নিয়ে বের হতে বললেন। সে শুনতে পেল বলে মনে হল না। বিত্তশালী পাড়ার সুরকি সিমেন্টের স্ল্যাব বসানো গলি পেড়িয়ে অন্য পাড়ার ভিতর দিয়ে আশি-ফুট রাস্তা ধরে রেল লাইনে উঠলো ইরাম। রেল লাইনের কিনার দিয়ে হাঁটছিল আর ভাবছিল। রেললাইনে

হাঁটতে হাঁটতে ভাবনায় ডুবে যেতে ভালবাসে, যদিও ইরামের এই হাঁটার বিষয়টা তার মা একদম পছন্দ করে না। ভাবতে ভাবতে গন্তব্যে পৌঁছালো।

বিশাল বাড়ী। গেটের একদিকে বাড়ী ঘিরে থাকা দেয়াল ঘেঁষে তিনটি ছোট ছোট দোকান অন্যপাশে তিনটি বিশাল বিশাল গাছ। দোকানের একটি ডালপুরির, একটি দরজীর ও অন্যটি হোমিওপ্যাথি দাওয়াখানা। বাড়ীর মালিক সরকারী কর্মকর্তা। তিনপুরুষের ভিটা এই বাড়ী তার আবেগ, চাকরী তার কর্তব্য আর হোমিওপ্যাথি চর্চা হচ্ছে শখ। আবেগ-কর্তব্য-শখ নিয়ে বিভোর লোকটির একমাত্র সন্তান ঈশানী। ইরামের বন্ধু সে। পরীক্ষা শেষ তাই ঈশানী বিকালে বিকালে দাওয়াখানায় বসে। ইরাম ঈশানীকে খুব পছন্দ করে। আজকের ঘটনা তাকে বলবে বলেই এসেছে। এসেই দেখে দোকানগুলোর সামনের চিলতে বারান্দাতে এক অন্ধ ফকির বসা।
‘হেঁটে আসলি তুই, বাবার আজ আসতে দেরী হবেরে’ বললো ঈশানী ।
‘রিকশা করেই ফিরবো আমি’ আশ্বস্থ করলো ইরাম।
তারপর বললো ‘তোর শখের পুরীর দোকান আজ দেখি জমজমাট!’
‘আজ লক্ষী এসেছে যে’
ইরামের চোখে প্রশ্ন। ঈশানীও চোখের ইঙ্গিতে অন্ধকে দেখিয়ে বলে
‘যেদিনই এসে বসে সেদিনই পুরী কিনতে অনেকে আসে’
‘সত্যিই!’
‘মিথ্যা বলে কি লাভ’
ইরামের চোখে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি এক ছায়া খেলে গেল। বাবার দাওয়াখানার মতই ঈশানীর শখের সৃষ্টি এই পুরীর দোকান। যদিও ঈশানীর মা এই গলির সাবেকী বাড়ী, হোমিও দাওয়াখানা, পুরীর দোকান নিয়ে ত্যক্তবিরক্ত আর বিষন্ন। স্বামীর বিরাট চাকরীর সূত্রে আলিশান ঝকঝকে সরকারী বাড়ীতে থাকার সুযোগ ছিল। তা হলো না। তাদের বাগানের মালী ও তার বউকে দিয়ে ঈশানী পুরীর দোকান শুরু করিয়েছে। অর্থ জোগানো, খরচপাতির হিসাব দেখা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা ঈশানীর কাজ। মালীর বউ ডাল ঝেড়ে-বেছে ধুয়েছে কিনা, হাত ধুয়ে ময়দা মাখলো কিনা সব খুঁটিয়ে দেখে ঈশানী। মালী বিকালে সাফসুতরা কাপড়জামা ও মাথায় বাবুর্চির টুপি পরে দোকানে চুলা জ্বালায়। নিঃসন্তান মালী দম্পতি ঈশানীর সাথে এই মজার কাজে মহা উৎসাহে লেগে আছে। মানুষ ভালবেসে শখের কাজ করলে তা ভাল না হয়ে যায় না। তবে বিকাল বিদায় ও সন্ধ্যা আগমনের সন্ধিক্ষণ, রহস্যময় লক্ষী, অন্ধ ফকিরের উপস্থিতি, পুরীর দোকানের উপচে পড়া ভিড় দেখে ইরামের ধাঁধা লাগছিল। হোমিওপ্যাথির জন্য লোকজন আসে দেরীতে। তারা জানে ডাক্তার সাহেব অফিস করে চা-নাশতা খেয়ে তবেই দাওয়াখানায় আসেন।
ইরাম এই অবসরে আস্তে আস্তে আজকের দিনের অভিজ্ঞতা বলে যায়। সব শুনার পর ঈশানী বললো ‘গল্পটা পড়ে শুনাতো।’
ইরাম উৎসাহ নিয়ে গল্পটা পড়ে শুনালো। শুনে শামীম মুগ্ধ স্বরে বলে উঠলো

‘বাহ্ ভাল লিখেছিস, আরে আমাদের কলেজের ইবাদ স্যারের কীর্তিটা লিখলি না কেন?’
‘আমিতো ঘরের ভিতরের গল্প বলছি শুধু, এটাও ছিঁড়ে ফেলবো, পুড়িয়ে ফেলবো’ হতাশ গলায় ইরাম বললো।
ঈশানী কি বলবে ভেবে পেলোনা। আচমকা বললো ‘চল ডালপুরি খাই, রশুন-কাঁচামরিচ দিয়ে তৈরি তেঁতুলের সস তা দিয়ে মাখিয়ে পুরী খেতে অপূর্ব!’
গরম গরম ডালপুরি তেঁতুলের টক ঝাল চাটনি দিয়ে খেলো ওরা। ইরাম ক্ষুধার্ত ছিল বলে ওর কাছে অমৃতের মত লাগলো খাবারটা। এইসময় পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে অন্ধ ফকির উঠে দাঁড়িয়েছে। অবাক হল দেখে যে ওর হাতে ধরা ভিক্ষার থালিতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। জ্বলতে জ্বলতে ক্ষয় হওয়ার পথে প্রায়। ইরাম ঈশানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফকিরের পিছু নিল। শীতের রাস্তাতে ল্যাম্পপোস্টের ভুতুড়ে আলো। ইরাম অন্ধের পাশে পাশেই হাঁটছিল। অবাক হয়ে দেখলো ও যে গলিতে যাবে সে গলিতেই ঢুকছে ফকির। শুনশান গলি। ইরাম আর অন্ধ ফকির। ইরাম তার শীতের জ্যাকেটের পকেট থেকে গল্প লেখা কাগজটা বের করে মোমবাতির আগুনে ধরলো। হঠাৎ ভৌতিক কাণ্ডের মত চাদরের ভিতর থেকে ফকিরের আরেকটা হাত বেরিয়ে এসে ছোঁ মেরে গল্পটা নিয়ে নিল। ইরাম ভয়ে খামোশ হয়ে রইলো। এরপর তা ইরামের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ফকির বললো
‘‘কেউ একজন বুঝেনি বলে নিজের কষ্ট করে তৈরি জিনিস নষ্ট করবে মা? এ কেমন কথা! একজন বুঝলো না তাতে কি? অন্য কেউ বুঝবে, আজ মর্যাদা দিলনা তো কি? আগামীকাল দেবে।’
কথা শেষ করেই অন্ধ ফকির তস্য গলিতে নিমেষেই উধাও হল। ইরাম ভয়ে বিহ্বল, হতভম্ব। তখনি একটা রিক্সা গলিতে ঢুকলো যেন ইরামকেই নিতে। দরদাম না করেই গন্তব্য বলেই রিক্সায় উঠে পড়লো ও। ভেবে কুল পেল না অন্ধ ফকির মোমবাতি নিয়ে কেন চলে? অন্ধ কিভাবেই দেখলো যে সে কাগজটা পুড়াতে চাইছে? ফকিরের একটা কথা তার কানে অমোঘ সত্যের মত ঝংকার তুলছে ‘আজ মর্যাদা দিলনা তো কি? আগামীকাল দেবে’।